নভেম্বর,২০১৮

জার্মান প্রবাসে

এক টুকরো বাংলাদেশ

সূচিপত্র

৩ আমাদের কথা

৪ এক পলকে ইউরোপ ভ্রমণের টুকিটাকি

৯ কোস্টারিকার বিশুদ্ধ জীবন

২০ চেনা সুর, অচেনা বাদক

২২ কবিতা- সৈনিকের দুঃস্বপ্ন

২৩ অক্টোবর ফেস্ট

২৭ নোটিশ বোর্ড

আপনার একটা চাওয়া, একটা মন্তব্য অথবা আপনার কোন অভিজ্ঞতা ভাগ করুন না আমাদের সাথে! চটজলদি লেখা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়ঃ german.probashe@gmail.com । পাঠকের আনন্দে পূর্ণ হোক আমাদের সার্থকতা।

আমাদের কথা

ভ্রমণ পছন্দ নয় এমন মানুষ পাওয়া নিঃসন্দেহে দুষ্কর। ইউরোপে যাঁরা থাকে তাঁদের জন্য বিনা ভিসায় প্রতিবেশী নানা দেশে ঘুরে বেড়ানোর মজা যেন একটু আলাদাই। ভ্রমণ পিপাসুদের সুবিধার কথা চিন্তা করেই আমাদের এবারের ম্যাগাজিন ভ্রমণ বা ট্রাভেলিং নিয়ে।

ঘরকুনো বাঙ্গালি হিসেবে আমাদের দুর্নাম আছে বটে কিন্তু এই সংখ্যার লেখাগুলো পড়লে সেই তকমার অবসান হতে পারে। পুরো ইউরোপ জুড়ে সহজে কম খরচায় ভ্রমণের পথ বাতলে দিয়েছেন মুনশী আরিফ রশীদ। সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডঃ নিশি লিখেছেন কোস্টারিকা ভ্রমণ নিয়ে সুপাঠ্য রচনা, দুবাই থেকে গৃহবধূ মনিরা সুলতানা লিখেছেন তাঁর অনুভূতি। আছে ডঃ রিমের কবিতা 'সৈনিকের দুঃস্বপ্ন' এবং মিউনিখের বিখ্যাত অক্টোবর ফেস্টের আদ্যপান্ত নিয়ে হোসাইন মুহাম্মদ তালিবুল ইসলামের তথ্যবহু প্রবন্ধ।

ভ্রমণ যাঁদের স্বপ্ন তাঁদের জন্য এবারের সংখ্যা শুধু উপাদেয়ই নয়, তথ্যের খনিও বটে। আশাকরি বরাবরের মতই আপনারা আপনাদের ভালবাসা, উদ্যম নিয়ে আমাদের ম্যাগাজিনের সাথেই থাকবেন আর ম্যাগাজিন পড়েই ঘুরতে বেরিয়ে যাবেন। কারণ, মার্ক টোয়েন বলে গেছেন " বিশ বছর আগে যা তুমি করেছ তার থেকে যা তুমি করনি তা নিয়েই তুমি বেশি হতাশ হবে।"

ধন্যবাদান্তে
টিম জার্মান প্রবাসে

রোববার
২৫ নভেম্বর ২০১৮
১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫

এক পলকে ইউরোপ ভ্রমণের টুকিটাকি

ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা আমাদের প্রায় সকলের মধ্যেই আছে। সময় এবং সুযোগ পেলে ইউরোপ ঘুরবে না এমন বাঙালী পাওয়া যাবে না। এর পেছনের বড় একটা কারণ ইউরোপ অনেকটা গ্রামের যৌথ পরিবারের মত। ওখানে একবার সীমানা প্রাচীরের ভেতরে ঢুকলে যেমন আলাদা আলাদা দাওয়াত নিতে হয় না, সকালে বড় চাচার ঘরে তো দুপুরে ছোট চাচার ঘরে খাওয়া হয় তেমনি ইউরোপে একবার সেঞ্জেন ভিসায় ঢুকলে ইউ অন্তর্ভুক্ত ২৭টি দেশে অবাধে ঘুরে বেরান যায়। আর ভ্রমণকারীদের দেবার জন্যে প্রতিটি দেশের আছে আলাদা আলাদা ধরনের সম্পদ। তবে প্রথমবার আসার পরে বুঝতে বুঝতে মূল্যবান্ সময় থেকে কয়েকদিন চলে যায়। তাই তাদের ভ্রমণকে সহজ করবার জন্যে নিজের অভিজ্ঞতা এবং ইন্টারনেট থেকে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে কিছু পরামর্শ নিচে দিলাম-

১। আগেভাগে প্ল্যানিংঃ কোথাও যাবার সিদ্ধান্ত নেবার পর ট্রিপ প্ল্যান এর খসড়া যত দ্রুত সম্ভব করে ফেলা উচিত। কারণ আগেভাগে বুক করে রাখলে বাস, ট্রেন, প্লেন থেকে শুরু করে হোটেল বা হোস্টেলে খরচ অনেক কম পরে।

২। হোটেল না হোস্টেল? ব্যাকপ্যাকারদের জন্যে হোটেল এর থেকে ইয়ুথ হোস্টেলগুলো অনেক সাশ্রয়ী, ইয়ুথ হোস্টেল খুঁজতে ঢুঁ মারতে পারেন, hostelworld.com. আপনার গন্তব্যের শহরের নাম,

Santorini, Greece

কবে থেকে কবে কবে কজন থাকতে চান সেটা লিখে সার্চ করুণ এখানে। সার্চ রেজাল্ট থেকে আপনার বাজেট এবং সিটি সেন্টার থেকে হোস্টেলটির দূরত্ব এই দুটি ব্যাপার মাথায় রেখে কয়েকটি হোস্টেল নির্বাচন করুন এবং প্রত্যেকটি নতুন ট্যাবে ওপেন করুন। এবার প্রত্যেকটির ফ্যাসিলিটিজ সেকশন দেখুন, যেমন লিনেন (বালিশ, কম্বল, টাওয়াল), ওয়াই-ফাই এগুলো ফ্রি কিনা, নাকি আলাদা টাকা দিতে হবে এর জন্যে? আপনি প্লেনে করে গেলে এয়ারপোর্ট থেকে ওদের শাটল্ বাস আছে কিনা? এরপরে রিভিউ

সেকশনে পড়ুন অন্তত আগের ৬/৭ জন ট্রাভেলারের মন্তব্য। কয়েকটির মধ্যে তুলনা করে তারপরেই বুক করুন আপনার পছন্দের হোস্টেল। আর যদি হোটেলে থাকতে চান তবে খুঁজুন booking.com-এ। এখানেও আগের প্রক্রিয়া ফলো করুন। এছাড়া আছে couchsurfing বা aibnb, সেগুলো নিয়ে অন্য একটি লেখা না হয় লিখলাম।

৩। ডেইলি ট্র্যাভেল টিকিট না সিটি পাস? ইউরোপের প্রায় প্রতিটি শহরেই গনপরিবহনের জন্যে ডেইলি ট্র্যাভেল পাস পাওয়া যায়। এছাড়া বড় শহরগুলোতে আছে সিটি পাস যেটা দিয়ে গনপরিবহনের সঙ্গে প্রধান টুরিস্ট আকর্ষণগুলোতে প্রবেশ করা যায়, এছাড়া অনেক সময় এর সঙ্গে সিটি ভেদে থাকে নানা রকম ক্রুজের ব্যবস্থা (যেমন প্যারিসে দ্য সেইন নদীতে বা বার্সেলোনায় হারবার ক্রুজ)। আপনার বাজেটের সঙ্গে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন কোনটা আপনার জন্যে উপযুক্ত। তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন, ডেইলি ট্র্যাভেল পাস নিলে টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনগুলোতে ঢোকার সময় আলাদা টিকিট করতে হবে, তাই আপনি যেগুলোতে যাইবেনই সেগুলোর টিকিটের দাম আলাদা ভাবে জেনে সব একসঙ্গে যোগ করুন।

আবার অন্যদিকে সিটি পাসের অফারে সবসময় সব প্রধান আকর্ষণ থাকে না (যেমন প্যারিসে আইফেল টাওয়ার কভার করে না), তাই সব ভালো মত দেখে সিদ্ধান্ত নিন। সাধারণত, ট্র্যাভেল পাস এক, দুই, তিন, সাত দিন এমন নানা সময়ের জন্যে পাওয়া যায়, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কিনুন।

৪। রোমিং ইন্টারনেট আছে কি? যেখানে গিয়েছেন আপনার মোবাইল ডেটা প্যাক কি সেখানে রোমিং ইন্টারনেটের সুবিধা দিচ্ছে? যদি দিয়ে থাকে তাহলে তো খুব ভালো, না হলেও সমস্যা নেই।

সেক্ষেত্রে নামিয়ে ফেলুন Scout GPS Maps and Navigation। এটা পুরো একটি দেশের ম্যাপ ডাউনলোড করতে দেয়। ইন্টারনেট ছাড়াই অফলাইনে সেখানে ঐ দেশের যে কোন জায়গার ঠিকানা দিলে সঠিক দিক নির্দেশনা তো দেয়ই এর সঙ্গে আছে ক্যাটাগরি সার্চ, যেখান থেকে খোঁজা যায় আশেপাশের খাবার জায়গা, টুরিস্ট আকর্ষণ, শপিং সেন্টার, পাবলিক সার্ভিস সহ নানা কিছু।
Scout ম্যাপ দিয়ে না হয় পায়ে হাঁটা বা গাড়িতে যাওয়া পথ খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু গনপরিবহনের ক্ষেত্রে কি হবে? সেটারো সমাধান আছে, একটু খুঁজলেই মোটামুটি সব বড় শহরের জন্যে অফলাইন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রাউট প্ল্যানার পেয়ে যাবেন। ওটা নামানো থাকলে আপনাকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না শহরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কোন কোন বাসে, ট্রামে বা ট্রেনে কি করে যাওয়া যায়।

৫। বাস, প্লেন না ট্রেন? এক শহর থেকে অন্য শহরে কি করে যাবেন সেটা নিয়ে চিন্তায় পরে গিয়েছেন? চিন্তার কিছু নেই, আপনাদের এই সমস্যার সমাধান আছে goeuro.com এ। এখানে শহরদুটির নাম আর আনুমানিক ভ্রমণ তারিখ দিলে বাস, ট্রেন এবং প্লেনের সব অপশনই যার যার ট্যাবে আলাদা করে দেখাবে। ভ্রমণ তারিখ দুই/চার দিনে আগে পরে দিয়ে দেখতে পারেন, কারণ বাজেট এয়ারলাইনগুলোর ভ্রমণ তারিখ পরিবর্তন হলে প্রায়শই টিকিটের দাম পরিবর্তন হয়।

Hallstatt, Austria

৬। নাকি রোড ট্রিপ? যারা রোড ট্রিপে বের হবেন তারাতো নিজেদের পরিবহন সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলেছেন, তবে গাড়িব ক্ষেত্রে বাড়তি একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে পার্কিং। প্রথম সমস্যা পার্কিং প্লেস খুঁজে পাওয়া, এরপর বড় শহরগুলোতে পার্কিং বেশ ব্যয়বহুল (যেমন আমস্টার্ডাম সিটি সেন্টারে একদিনের জন্যে ৫০ ইউরো এর উপর), এছাড়া দেখা যায় শহরের ভেতরে মেইন টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনগুলোর কাছাকাছি প্রায়শই খালি পার্কিং স্পেস পাওয়া যায় না ফলে অনেক সময় দুই কিলোমিটারো হাঁটতে হয়। সেক্ষেত্রে খুব বড় শহর গুলিতে হোস্টেল বা হোটেলে গাড়ি রেখে অথবা একদিনের ট্রিপ হলে Park and Ride(P+R) এর পার্কিং এ গাড়ি রেখে ট্র্যাভেল পাস কিনে ঘুরে বেড়ানোটা বেটার।

৭। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হাতে সময় থাকলে চেষ্টা করুন স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে অন্তত একটা সন্ধ্যা সময় কাটাতে। কারণ একটি দেশ সম্পর্কে জানবার অন্যতম একটি মাধ্যম ঐ দেশের মানুষকে জানা, তাছাড়া উপরি পাওনা আড্ডা দেওয়া সেই সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার ক্ষেত্রে পরামর্শ পাওয়া। এখন রাস্তায় কাউকে দাড় করিয়ে তো আর গল্প শুরু করা যায় না তাই যোগাযোগের ভালো একটা মাধ্যম হতে পারে কাউচ সার্ফিঙ এর উইকলি মিটিং। প্রতিটি বড় শহরেই সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন কাউচ সার্ফিঙ এর মিটিং হয়। কাউচ সার্ফিঙ এর সাইট থেকে খুঁজে বের করুন সময় ও স্থান, এরপর হাজির হয়ে জান সেখানে। স্থানীয় মানুষ ছাড়াও পরিচিত হবেন নানা দেশ থেকে আসা আপনার মত ট্রাভেলারদের সঙ্গে। উইকলি মিটিং ছাড়াও কাউচ সার্ফিং থেকে সন্ধান পেতে পারেন নানা ধরনের ইভেন্টের, তাই ওদের ইভেন্ট সেকশনটাতেও একটু চোখ বুলিয়ে নিবেন।

৮। ফ্রি ওয়াকিং ট্যুরঃ আপনি আমার মতো ইতিহাস প্রেমী হন বা না হন যে কোন বড় শহরে প্রথমবার যাবার পরে অবশ্যই একবার ওয়াকিং ট্যুরে অংশগ্রহণ করা উচিত। গুগলে Free walking tour লিখে শহরের নাম দিয়ে একটু সার্চ করলেই অনেক পেয়ে যাবেন, এর মধ্যে আপনার সময় আর ওদের আইটেনারী দেখে পছন্দ করে নিন একটা। এটার মজা হচ্ছে ঐ শহরের প্রকৃত ইতিহাস তো জানা যায়ই সেই সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় নানা লোককথা যেগুলো হাজার বছর ধরে স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরছে।

Belvedere Place, Vienna, Austria

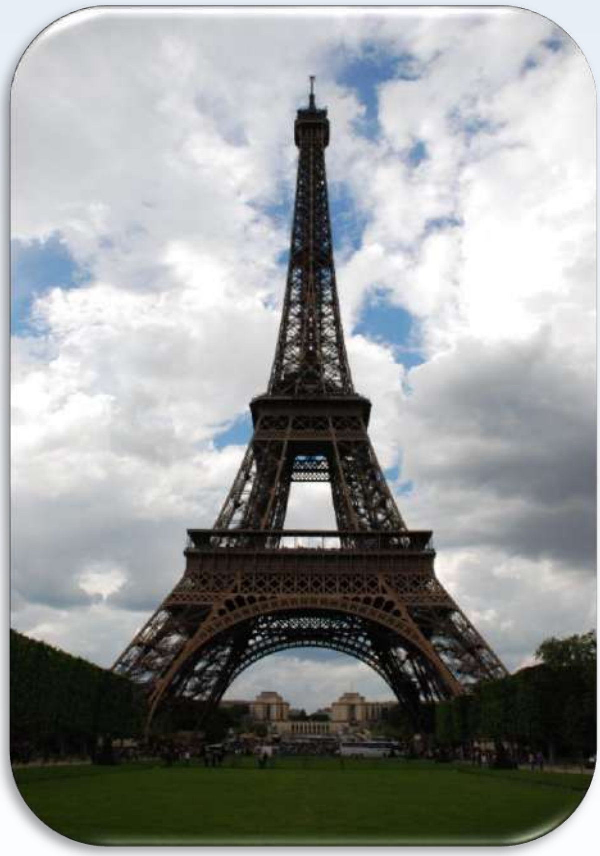

যদিও বলা হয় ট্যুরগুলো ফ্রি তবে ট্যুরের শেষে গাইড একটা ডোনেশন নেয়, আপনি আপনার ইচ্ছামতো যা খুশি দেন সে তাতেই খুশি।

৯। খাবারঃ স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতে ভুলবেন না কিন্তু। তবে চেষ্টা করবেন প্রধান টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনগুলোর কাছে পিঠের রেস্টুরেন্ট গুলো এড়িয়ে চলতে, ওখানে দাম থাকে আকাশ ছোঁয়া অথচ খাবারের মান তত ভালো নয়। একটু গুগল করলেই পেয়ে যাবেন চিপা গলির স্থানীয় মানুষদের পছন্দের রেস্টুরেন্টের সন্ধান।

তো এই হল ইউরোপ ভ্রমনের চিট কোড। তবে আর দেরি কেন, কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে প্রিয় মানুষ কিংবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হইহুল্লোড় রবে বেরিয়ে পড়ুন নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারে।

মুনশী আরিফ রশীদ
জারল্যান্ড ইউনিভার্সিটি, কম্পিউটার অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি, জারব্রুকেনে।

পুরা ভিদা _ কোস্টারিকায় বিশুদ্ধ জীবন

Pura vida... মানে হলো, Pure life... বিশুদ্ধ জীবন...

বিশুদ্ধ জীবন কথাটা বোধয় থিওরিটিক্যাল। আমি অন্তত তাই ভাবতাম। এই মানে যে পুরো একটা জায়গা আছে সেই তথ্যটা আমার জানা ছিল না। আর থাকবে বা কী করে? জীবনের অনেকটা সময় তো একটা গর্তের ভেতরে কাটিয়েছি। কখনও কি ভেবেছি বিশুদ্ধ জীবন আসলে কী ? একটা ঝামেলাহীন জীবন চেয়েছিলাম। সবাই যা চায় তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ? কে জানে সত্যি হয়ত আছে। তাই পুরা ভিদার কথা জানতে পারে মনটা খুশি হলো।

অলমোস্ট দূষণমুক্ত বনজঙ্গলে ভরপুর... রেইন ফরেস্ট, ক্লাউড ফরেস্ট আর আগ্নেয়গিরির দেশ। তার একপাশে ক্যারিবীয়ান সাগর, অন্যপাশে প্রশান্ত মহাসাগর। আসলেই Pura vida। বলছিলাম কোস্টারিকার কথা। আমি যেখানেই যাই, কি করে যেন সাগর আর পাহাড়ের কম্বিনেশন পেয়ে যাই। আসলে অবচেতন মনে নিজেই যে কখন সাগর আর পাহাড়কে বেছে নেই, আমি নিজেও জানিনা। আমি নিজেও কোন এক দ্বীপকন্যা বলেই হয়তো।

আমরা অবতরণ করি কোস্টারিকার ক্যাপিটাল সিটি স্যান হোসের বিমানবন্দরে। ল্যান্ডিং এর সময়টা আমি সবসময় দেখতে দেখতে ল্যান্ড করা পছন্দ করি। শূন্য থেকে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এক নতুন ভূমিকে স্পর্শ করা খুব রোমাঞ্চকর লাগে আমার। শহরের নাম,

কিন্তু এবার ঠিক ল্যান্ডিং টাইমেই আমার খুব মাথা ঘুরছিলো। তাই দেখা হয়নি। এনিয়ে আক্ষেপ করতে করতে প্লেন থেকে নামলাম। ইমিগ্রেশনের লম্বা লাইন। ধীরগতিতে কাজ চলছে। টিভিতে ট্যুরিজম সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। তাই দেখতে থাকলাম মনোযোগ দিয়ে। বনজঙ্গলে আর আগ্নেয়গিরির দেশে এই প্রথম। ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত, দুই সমুদ্রের দিক থেকে দুই টেকনোটিক প্লেট (ক্যারিবীয়ান টেকনোটিক প্লেট ও প্যাসিফিক টেকনোটিক প্লেট) একে অপরকে ধাক্কা দেয়ায় সেই ধাক্কার লাইন বরাবর তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটা আগ্নেয়গিরি। আর প্রশান্ত উপকূলে কোস্টারিকার সমুদ্রসীমাতেই আছে শ'এর উপর আগ্নেয়গিরি।

সবকটি সাগরের তলদেশে। এতগুলোর মাঝে বর্তমানে মাত্র ৪-৫টা সক্রিয় বা সুপ্ত অবস্থায় আছে। এভাবে আগ্নেয়গিরির ক্রমাগত উদগীরণ ও লাভার শীতলীকরণের মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ভূভাগের ঠিক মাঝখানে প্রাকৃতিক সেতুর মতো তৈরি হয়েছে এই দেশ। দুই আমেরিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত বলে দুই আমেরিকা থেকেই জীবজন্তু দেদারসে এখানে অভিবাসন করেছে। তাই এখনকার জীবজগৎ অন্য যে কোন একক দেশ বা মহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জীববৈচিত্র্য এখানেই বিদ্যমান। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী!

ইমিগ্রেশনের কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হলো। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে এলাম। মনে মনে রেডি হয়েছিলাম, বের হয়েই গরমের প্রথম ধাক্কা টের পাওয়ার জন্য। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তেমন কিছুই হলোনা। ট্রপিক্যাল দেশ হিসেবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আরো অনেক গরম হবে বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু বেশ আরামদায়ক তাপমাত্রা। আমাদের কার রেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভকে খুঁজে পেলাম। এরপর শাটলে করে নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে আমাদের গাড়ি বুঝে নিলাম। এরপর রওনা হলাম কোস্টারিকায় আমাদের প্রথম গন্তব্যে। প্রায় ৩ ঘন্টার ড্রাইভিং দূরত্বে লা ফরচুনা নামের এক পার্বত্য শহরে।

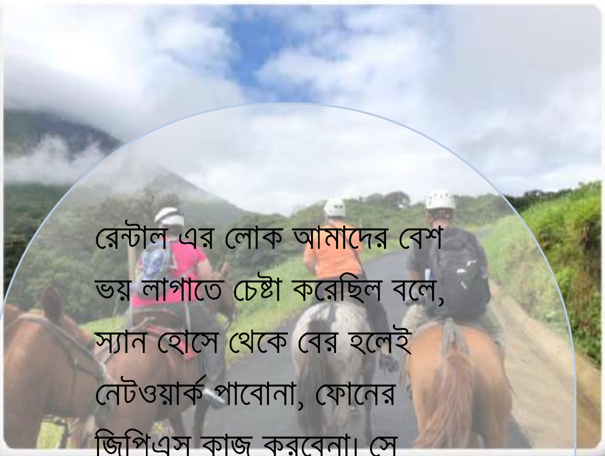

রেন্টাল এর লোক আমাদের বেশ ভয় লাগাতে চেষ্টা করেছিল বলে, স্যান হোসে থেকে বের হলেই নেটওয়ার্ক পাবোনা, ফোনের জিপিএস কাজ করবেনা। সে আসলে চাইছিলো তাদের জিপিএস ডিভাইস গছিয়ে দিয়ে আরো কিছু পয়সা খসাতে।

আমরা আসার আগে ভলোভাবেই জেনে এসেছিলাম, এখানে ওয়েজ (গুগলের আরেকটা ম্যাপ সার্ভিস) খুব ভালো কাজ করে। তাই কর্ণপাত করলাম না তাদের কথায়। কিন্তু মনে মনে একটু ভয়ও পাচ্ছিলাম। যাই হোক, ড্রাইভ শুরু হলো আমাদের।

শহর থেকে বের হতেই দেখি আমরা পাহাড়ে উঠছি। স্যান হোসে শহরটাই আসলে পাহাড়ের কোলে। আর আমাদের যাত্রাপথটাও কোস্টারিকার পাহাড়ি অঞ্চল ধরেই। স্যান হোসে থেকে বের হয়ে মনে হলো বাংলাদেশে চলে এসেছি। আমাদের মফস্বলের মতোই বাড়িঘরের ধরন। তফাৎ শুধু পরিচ্ছন্নতায়, দূষণমুক্ততায়। হঠাৎ ক্ষিদা পেটে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সাধারণত কোথাও বেড়াতে গেলে আমরা পিজ্জা, ফিশ বার্গার, ক্যাসাদিয়া কিংবা সি ফুড এগুলো দিয়েই খাওয়া সারি। কিন্তু এবার আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যেখানেই যাই, লোকাল খাবার ট্রাই করবো। এখানকার ট্রাডিশনাল লোকাল খাবারের দোকানগুলোকে বলে সোদা। কোন ফ্যান্সি রেস্টুরেন্ট না, অনেকটা আমাদের দেশের রোড সাইড ক্যাফেগুলোর মতো। ওয়েজ দেখে কাছাকাছি এক সোদায় নামলাম। এখানকার ট্র্যাডিশনাল ফুডকে বলে ক্যাসাদো। এটা অনেকটা সেট মেনু টাইপ। ওখানে ট্রেতে সাজানো থাকে বেশ কিছু আইটেম। আপনি নিজে দেখে দেখে বলবেন কোনটা কোনটা নিতে চান। অনেক সোদায় অবশ্য এভাবে রেডি করা থাকেনা। কিছু প্রি সেট মেনু থেকে অর্ডার করতে হয়।

ক্যাসাদোর কমন আইটেম গুলো হলো ব্ল্যাক বিনস দিয়ে রাইস যেটাকে বলে গালা পিন্টো, প্লেনেটেন (কলাকে ভেজে তৈরি করা মিষ্টি একটা ডেজার্ট টাইপ আইটেম), সালাদ, সিদ্ধ সবজি/ম্যাশ পটেটো, একটা প্রোটিন, আর বিফ দিয়ে ডালের একটা আইটেম। সমস্যা হলো ভাষা। এদের বেশিরভাগই একেবারেই ইংরেজি জানেনা।

আমরা যেহেতু হালাল-হারাম বাছ-বিচার, তাই কোন প্রকার মিট যেন আমাদের প্লেটে না আসে, সেজন্য কমিউনিকেট করাটা খুব জরুরি। অনেক কষ্টে ইশারায় আকারে ইঙ্গিতে বোঝালাম আমরা কি চাই। ক্যাসাদোর সাথে প্যাসকাদো (মাছ) নিলাম। পেটে প্রচন্ড ক্ষিদা ছিল বলে কিনা জানিনা, খুবই সুস্বাদু আর উপাদেয় লাগলো খাবার। আমি ঘোষণা দিয়ে ফেললাম, আগামী কয়েকদিন আমি ক্যাসাদোর উপরেই থাকবো।

পেট শান্ত করার পর আবার পাহাড়ি পথ বেয়ে চলতে থাকলাম।যেদিকেই তাকাই শুধু সবুজ আর সবুজ। মাঝেমাঝে বাড়িঘরও আছে। বেশির ভাগ বাড়ির সামনে অনেক ফুলগাছ।

একতলা বাড়ি সব, কোনটা টিনশেড, কোনটা পাকা। উঠোনে ফুটে আছে নানা রকম ফুল। বাগানবিলাস, জবা, অলকানন্দা, অর্কিড তো অহরহ। আরো কত নাম না জানা ফুল! আমি আসলে তেমন ফুল চিনিই না। চেষ্টায় আছি চেনার। পাহাড়ের সৌন্দর্য নিয়ে আর কি বলবো! আমার কাছে মনে হয়েছে যেন বান্দরবান, খাগড়াছড়ি চলে এসেছি। এতো সুন্দর তার রূপ! দূর পাহাড়ের মাথায় মেঘগুলো ভাসছে। কি অসাধারণ লাগছিলো! আমি বৃথাই ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে থেমে থেমে অবশ্য কিছু ছবি তুলেছি। এভাবে একসময় চলে আসলাম আমাদের গন্তব্য ছোট্ট পার্বত্য শহর এরিনাল আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন লা ফরচুনায়। শহর না বলে গ্রাম বলাই বোধ হয় ভালো হবে। এরিনাল আগ্নেয়গিরি ও লেক এরিনালকে কেন্দ্র করে লা ফরচুনা, এরিনাল এই ছোট্ট শহরগুলো গড়ে উঠেছে।

সময় নিয়ে দেখতে দেখতে যাওয়ায় আমাদের ৩ ঘন্টার যাত্রা শেষ হয়েছে ৪.৫ ঘন্টায়। যখন আমাদের রিসোর্টে পৌঁছাই, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখানকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী অনেক তাড়াতাড়িই সূর্য ডোবে। অবশ্য সেজন্য উদয়ও হয় তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যা নামার পর আসলে তেমন কিছু করার থাকেনা। এখানে কোন ভাইব্রেন্ট নাইট লাইফ নেই। রিসোর্টের ডেস্কের মেয়েটাও ইংরেজি জানেনা। তার সাথেও আকারে ইঙ্গিতে কথা সেরে রুমের চাবি বুঝে নিলাম। আগ্নেয়গিরিটা কোথাও উঁকি দিচ্ছে নাকি খেয়াল করার চেষ্টা করতেই মেয়েটা বুঝে গেল। ইঙ্গিতে জানালো সামনেই মেঘে ঢাকা যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, সেটাই এরিনাল ভলকানো যাকে দেখার জন্য এখানে আসা।

কিন্তু প্রায় পুরোটাই মেঘে ঢাকা বলে বুঝার উপায় নাই। সেদিনের মতো দিনের সমাপ্তি করে আমাদের কটেজে চলে গেলাম। কটেজে ঢোকার সময় ঝর্ণা বা নদীর প্রবাহের কলকল শব্দ শুনতে পেলাম। রাতে অবশ্য খাওয়ার জন্য একবার বের হয়েছিলাম। এরপর ঘুমিয়ে পড়লাম বেঘোরে। আজকের দিনটায় অনেক জার্নি হয়েছে। সেই আটলান্টা থেকে দুইটা ফ্লাইট ধরে স্যান হোসে, এরপর ড্রাইভ করে লা ফরচুনা।

পরদিন ঘুম ভাঙলো ভোর ৫টায়। এখানে সূর্যোদয় হয় ৫.৩০ মিনিটে। আমি উঠে গেলাম। বারান্দায় গিয়ে ভোর হতে দেখলাম। শান্ত ভোরের স্নিগ্ধ রূপ। শিশির ভেজা সবুজ লনে হেঁটে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। কলকল শব্দের উৎস আবিষ্কার করলাম। পাশেই বয়ে গেছে ছোট্ট একটা নদী। গাছ থেকে বেশ কিছু কমলালেবু আকারের লেবু পড়ে থাকতে দেখলাম ঘাসের উপর। লেবু গাছ যে এত বড় হতে পারে! বৃক্ষ বলাই ভালো। ছোট্ট সবুজ লনকে ঘিরে কিছু একতলা, কিছু দোতলা কটেজ। ট্রপিক্যাল অঞ্চলের বিভিন্ন রকম ফুল আর গাছগাছালি। সেইসাথে পাখিদের ঘুম ভাঙ্গানিয়া কিচিরমিচির কলতানে মুখরিত চারদিক। অনেক নান্দনিক। প্রাতঃভ্রমণ সেরে রুমে ফিরে এলাম। তানবির, মানে আমার হাসবেন্ডকে জাগিয়ে দিলাম। এরপর তৈরি হয়ে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

আজকে আমরা জিপিং করতে যাব। এটা মূলতঃ দড়ির উপর ঝুলতে ঝুলতে কয়েক মাইল ভ্রমন। আমার জন্য অবশ্যই অনেক সাহসের ব্যাপার। কিন্তু এখানকার রেইন ফরেস্ট দেখার জন্য কয়েকটা উপায়ের মাঝে জিপিং রিকমেন্ডেড। রেইন ফরেস্টের আসল সৌন্দর্য কিন্তু এর উপরে। ভিতরে তো অন্ধকারের কারণে তেমন কিছু দেখা যায়না। গাছগুলোর উঁচু ডালপালা আর পাতা, ছাতা বা শামিয়ানার মতো গাঢ় ছায়া দিয়ে রাখে বনের ভূমিকে। এই শামিয়ানা বা ক্যানোপিই হল রেইন ফরেস্টের আসল সৌন্দর্য যেটা দেখতে হবে একটু উপর থেকে। And it was a great decision! নইলে রেইন ফরেস্টের আসল সৌন্দর্যই অদেখা থেকে যেতো। তবে ভবিষ্যতে আর সাহস হবেনা আমার এই জিনিস করার।

আমাদের সাথে আরেক যুগল এসেছেন জিপিং করতে। তারাও যুক্তরাস্ট্র থেকে এসেছেন। আমাদেরকে জিপিং এর প্রয়োজনীয় গিয়ার পড়িয়ে গাড়িতে করে জায়গামত নিয়ে যাওয়া হলো। ইন্সট্রাক্টর আমাদের প্রাথমিক নির্দেশমালা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে, না করতে হবে। দুজন ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। একজনের নাম অ্যান্টোনিও, অন্যজনের নাম মাইক। মাইক প্রথমে চলে গেলেন আমাদের হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে। অ্যান্টোনিও সবার শেষে যাবেন। ঐ যুগল শুভ সূচনা করলেন আমাদের জিপিং এর। এরপর এলো আমার পালা। আমি প্রস্তুত হয়ে শেষ মুহূর্তে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। তাই সরে গিয়ে তানবিরকে সুযোগ করে দেই। ও আমার উপর খুব রাগ করে চলে গেল দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে। আমি অবশ্য ওর ভিডিও ধারণ করছিলাম। এরপর অনেক সাহস জড়ো করে আমিও ঝুলে পড়লাম আল্লাহর নাম নিয়ে। মোট ১৩টা লাইন অতিক্রম করতে হয়েছিল আমাদের। প্রথম ৩-৪ টা পর্যন্ত আমি অনেক ভয় পেয়েছি। এরপর উপভোগ করতে শুরু করি। অপর যুগলের সাথেও কিছুটা আলাপ পরিচয় হলো। তারা প্রায় ১৮ বছর ধরে একসাথে আছেন, কিন্তু বিবাহিত নন।

মহিলাটার প্রায় আমার বয়সী একটা মেয়ে আছে যে নাকি তাকে নিত্য নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। পেশায় তিনি একজন মেডিকেল এসিস্টেন্ট। ইন্সট্রাক্টরদের একজন অ্যান্টোনিয়, বেশ কথকী। সেও জানালো কথায় কথায়, সেও অবিবাহিত, কিন্তু তারও তিন ছেলেমেয়ে আছে প্রাক্তন সঙ্গীর সাথে। কিন্তু সে তার সাথে প্রতারণা করে তার বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছে। কোস্টারিকার আইন নাকি বেশ নারীবান্ধব। যার সুযোগে তার প্রাক্তন সঙ্গী এহেন কাজ করতে পেরেছে। সত্যমিথ্যা আমরা জানিনা। তবু আফসোস প্রকাশ করলাম ভদ্রতার খাতিরে।

এভাবে গল্পে গল্পে হেসেখেলে, কখনোবা ভয়ে কাঁচুমাঁচু হয়ে ঝুলতে ঝুলতে একটার পর একটা লাইন পার হচ্ছিলাম। কি যে অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য উপর থেকে দেখতে পাওয়া যায়! ঘন রেইনফরেস্ট। এই বিশাল উঁচু উঁচু সব গাছপালা। কিন্তু আমরা ছিলাম প্রায় সেই বনের মাথায়। যেদিকেই তাকাই, চোখ ধাঁধাঁনো সবুজের বন্যা। জিপিং প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে সেসব দৃশ্য দেখতে দেখতে নেক্সট লাইনে ঝুলার জন্য রেডি হই। কোনো কোনো লাইনে ঘন্টায় ৮০কিমি বেগেও ছুটেছি। সবমিলিয়ে ভয়, অ্যাডভ্যাঞ্চার আর আনন্দের মিশ্র অনুভূতি! এর মাঝে তানবির আরেকটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলল। বাঞ্জি জাম্পের মতই অনেকটা টারজান সুইং করলো। টারজান সুইংটা হলো, প্রায় ১০০ ফুট একটা দড়ির সাথে নিজেকে বেঁধে শূন্যে লাফ দেয়া। আমি এসবে আতঙ্ক ছাড়া আনন্দের কিছু পাইনা।

শেষ ২টা লাইন অতিক্রম করার সময় দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য। অনিন্দ্য সুন্দর এক রিসোর্ট। উপর থেকে এরিয়াল ভিউ দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। তাই বুঝতে পারছিলাম কতখানি বিশাল আর সুন্দর এই রিসোর্ট। সেই মুগ্ধতা নিয়েই শেষ হলো জিপিং অভিযান। আমি যেন প্রাণে পানি ফিরে পেলাম।

রিসোর্টেই আনন্দ উপভোগের এতো আয়োজন, আর এতোই সুন্দর, অনায়াসে এক দুইটা দিন এখানেই কাটিয়ে দেয়া যায়। এতো সুন্দর একটা রিসোর্ট। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সক্রিয় ঝুঁকি অঞ্চলে অবস্থিত। আগ্নেয়গিরিটা জেগে উঠলেই এই সুন্দর রিসোর্ট স্মৃতিতে পরিণত হতে পারে। পুলে নামব ঠিক করলাম। এখানকার রিসোর্টগুলোর অন্যতম আকর্ষণ হলো হট স্প্রিং পুল। পানির উষ্ণতা ৪০ সেলসিয়াস। জিওথার্মাল এক্টিভিটির কারণে এই অঞ্চলে বেশ কিছু ন্যাচারাল হট স্প্রিং আছে। রিসোর্টগুলোর দাবি, তারা সেখান থেকে পাম্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে এই হট স্প্রিং পুলে। তাপমাত্রা একটু কমিয়ে সরবরাহ করতে হয় বৈকি।

হট স্প্রিং পুলের পানি যদিও ইনিশিয়ালি খুব গরম অনুভূত হয়, কিন্তু পরে এটাই আরামদায়ক লাগে। আমার তো ঠান্ডা পানির পুলে এখন আর নামতেও ইচ্ছা হয়না।

পুলসাইড থেকে আগ্নেয়গিরির বেশ চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরি দেখতে দেখতে প্রিয় মানুষের সাথে হট স্প্রিং পুলে স্নান! অতঃপর জাকুজি। আহা! কি মধুর সেই অনুভূতি। চূড়াটা যদিওবা এখন পর্যন্ত মেঘেই ঢাকা। হঠাৎ মনে হলো, অগ্ন্যুৎপাত দেখতে দেখতে এই পুলে স্নান করতে পারলেও বুঝি মন্দ হতোনা! বিপজ্জনক কিন্তু লাইফটাইম অভিজ্ঞতা হতো।

আরেকটা অভিজ্ঞতা না বললেই নয়। একমাত্র আমি ছাড়া আর কোন রমণী সেখানে আমার মতো এত বেশি কাপড় পরিধান করা ছিলনা। অবশ্য এমন অভিজ্ঞতা পশ্চিমের সব সৈকতেই হয়েছে। তবু এরকম রিসোর্টগুলোতে আরো অনেক বেশি। তাই পুলে নামার সময় আমার পুলের পোশাক দেখে অনেকেই অবাক হয়ে আড় চোখে দেখছিল। তবে অতটুকুই। প্রথম প্রথম অস্বস্তি অনুভব করলেও এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।

আমার সাঁতার জানিনা। আমার দৌঁড় পানিতে একটু দাপাদাপি করা পর্যন্তই। ও আবার সাঁতার জানে। তাই সাঁতরে নিল কিছুক্ষণ। পুলে দাপাদাপি শেষে ভেজা পোশাক পাল্টে নিয়ে রিসোর্টের ভিতরেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। এরপর রিসোর্ট প্রাঙ্গন আরেকটু ঘুরে ফিরে দেখলাম। এদেশের ট্রপিক্যাল ওয়েদারে যতরকম বাহারি শ্রাব আর ফুল গাছ হতে পারে তার সবকটিরই একটু একটু নমুনা মনে হয় এই রিসোর্টেই আছে।

ঘুরতে ঘুরতেই দেখলাম আগ্নেয়গিরির চূড়া থেকে মেঘ সরতে শুরু করেছে। অনেকটাই উন্মুক্ত হয়েছে আজকে। তাই দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম, আরো পরিস্কার দর্শন পাওয়া যেতে পারে এমন স্থানের সন্ধানে। কাছেই লেক এরিনাল। সেদিকেই গাড়ি ছোটালো তানবির। কিছুদূর যেতেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্থান পেয়ে গেলাম। বিশাল বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর আর বনজঙ্গলের মাঝে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০০০ ফুট মাথা উঁচু করে আছে এরিনাল ভলকানো। আমরা যে কয়দিন ছিলাম, এর চেয়ে ভালো আর দেখা যায়নি। চূড়ার কাছে আগ্নেয়গিরির লাভা নির্গমনের পথ বেশ পরিস্কারভাবেই দেখা যাচ্ছিল।

এরিনাল ভলকানো। কোস্টারিকার সবচেয়ে তরুণ আগ্নেয়গিরি। মাত্র ৭০০০ বছর এর বয়স। আগ্নেয়গিরি হিসেবে তরুণই বটে। প্রায় নিঁখুত মোচাকৃতির এই আগ্নেয়গিরি তার আকৃতির জন্যই বেশি জনপ্রিয়। যদিও সর্বশেষ বিস্ফোরণের পর মোচার মত নিঁখুত আকৃতি পুরোপুরি থাকেনি আর। সর্বশেষ এটি সক্রিয় হয়েছে ১৯৬৮ সনে। প্রায় ৪৫০ বছর বিশ্রামের পর এটি পুনরায় জেগে ওঠে আচানক এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের মাধ্যমে। স্বল্পসময়ে ৩টা ছবির মত গ্রাম ও শ'খানেক মানুষ সেই বিস্ফোরণের বলিদান হয়। এরপর অগ্ন্যুপাতের ভয়াবহতা ধীরে ধীরে কমে আসলেও কমবেশি চলতে থাকে। টানা ৪২ বছর বিভিন্ন মাত্রায় সক্রিয় থাকার পর ২০১০ সালে আপাত সর্বশেষ উদগিরণ হয়।

এরপর থেকে এই আগ্নেয়গিরি সুপ্তাবস্থায় আছে। তবে এই অঞ্চলের সক্রিয় জিওথার্মাল এক্টিভিটি বলে দেয়, এটি ভূমির কয়েক কিলোমিটার ভিতরে এখনো সক্রিয়। পরবর্তী বিস্ফোরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ধীরে ধীরে।

এরিনাল লেকের আশেপাশে আরেকটু ড্রাইভ করে সেদিনের মতো যাত্রা সমাপ্ত করে ফিরে এলাম। কটেজে ফেরার সময় একটা সোদায় নেমে ডিনার করে নিলাম। আমি বেশ উপভোগ করতে শুরু করেছি এখানকার লোকাল খাবার। খাবার দাবারের টুকটাক স্প্যানিশ নামও মুখস্ত করে ফেলেছি। কটেজে ফিরে পরদিনের প্ল্যান ফাইনাল করে আমরা ঘুমোতে গেলাম।

পরদিন সকালে প্ল্যান মোতাবেক সকাল সকাল নাস্তা সেরে আমরা পৌঁছে গেলাম নির্ধারিত স্থানে। আজ আমরা ঘোড়ায় চড়ে না শুধু, রীতিমত অশ্বচালনা করে আগ্নেয়গিরির পাদদেশে আগ্নেয় হ্রদ দেখতে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের অপর দু'জন সহযাত্রী অলরেডি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এবার দু'জন বান্ধবী। একজন আবার অশ্বচালনায় মোটামুটি পারদর্শীও। বাকি তিনজন আজকেই প্রথম অশ্বচালনা করবো। আমাদের ইন্সট্রাকর হেক্টর এসে প্রাথমিক নিয়মকানুন বলে দিলেন। এই উছিলায় অশ্বচালনার ছোট্ট একটা হাতেখড়ি হয়ে গেল। ঘোড়াকে কিভাবে লাগাম টেনে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, ডান বামে নিতে হয় হাতেকলমে জানলাম। এরপর আমরা নিজেদের ঘোড়ায় সওয়ার হলাম। আমার জনের নাম টিনা, ওর ঘোড়ার নাম ডল। সবকটাই মাদী ঘোড়া।

শুরু হল আমাদের যাত্রা। কখনো চড়াই, কখনো উতরাই, কখনো পিচঢালা রাস্তা, কখনো পাহাড়ি এবড়োথেবড়ো পথ, কখনো রেইন ফরেস্টের ভিতর দিয়ে, আবার কখনো বা ছোট্ট জলাধার পার হয়ে চলেছে আমাদের যাত্রা। সাথে বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে দেখা আগ্নেয়গিরি কিংবা এক পাহাড়ের উপর থেকে দূর পাহাড় অথবা সমতলের অদ্ভুত সুন্দর সব দৃশ্য তো ছিলই। এভাবে পৌঁছে গেলাম আগ্নেয়গিরির পাদদেশে অবস্থিত হ্রদের কাছে। এজন্য আমাদের সমতল থেকে বেশ খানিকটা উপরে উঠে আসতে হয়েছে। শান্ত স্বচ্ছ সবুজ হ্রদের পানি। হ্রদটা কিন্তু বেশি বড় না। হেক্টরের কাছে জানলাম, মাত্র কয়েক বছর আগে এর জন্ম হয়েছে। এটা এখনো বাড়ছে। হেক্টর আর আরেক একজন সহযাত্রীর ঘোড়ার ছিল পানি পিপাসা পেয়েছিল। ঘোড়াদুটো হ্রদের পানি পান করে নিল। সবাই একটা করে লাভা রক নিলাম শখের বশে। এরপর আরেকটা পাহাড়ের উপর উঠে এলাম আগ্নেয়গিরি ও তার হ্রদ একসাথে দেখা যায় যেখান থেকে। ওখানে ছোট্ট যাত্রাবিরতি দেয়া হল আমাদের। ঘোড়া থেকে নেমে এলাম। উপভোগ করলাম চারপাশের অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য। ওখান থেকে দেখা আগ্নেয় হ্রদ সহ আগ্নেয়গিরির দৃশ্যটা ছিল সবচেয়ে সুন্দর। যদিও চূড়া মেঘে ঢাকা ছিল।

হেক্টরের কাছেই জানলাম, ২০১০ সালে সর্বশেষ উদগিরণের পরেও নাকি এরিনাল আগ্নেয়গিরির চূড়া থেকে মাঝেমাঝে ধোঁয়ার মত কুন্ডলী পাকিয়ে উঠেছে বা এখনো উঠে। তাই এদেশের সরকার সার্বক্ষণিক এর গতিবিধি কঠোর নজরদারির মধ্যে রেখেছে। যেন হঠাৎ করে আরেকটি ট্র্যাজেডির জন্ম না হয়।

অথচ এই আগ্নেয়গিরিগুলোই এই দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ। এই আগ্নেয়গিরির লাভাই এখানকার ভূমিকে করেছে অনেক উর্বর। আমরা সবাই জানি, আগ্নেয়গিরি সম্বলিত ভূমি খুব উর্বর হয়। পৃথিবী তার গর্ভে যতরকম পুষ্টিকর খনিজ পদার্থ আছে, সব উগরে দেয় অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে। হয়তো বা ভূপৃষ্ঠকে উর্বর করার জন্যই! তাই অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হওয়ার কিছু বছরের মধ্যেই আবার সবুজে শ্যামলে সুশোভিত হয়ে ওঠে চারপাশ। কত যে চমকপ্রদ আর বিচিত্র এখনকার উদ্ভিদজগৎ। ট্রপিক্যাল অঞ্চল এমনিতেই বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। জায়ান্ট সাইজের নানারকম অর্কিড এখানকার বনবাদাড়ে এমনিতেই ফুটে থাকে। আর নানা বাহারের নানা রঙের গাছগাছালি তো আছেই। আমি বেশি ফুল বা গাছ চিনিও না। আর বনানী মানেই যে জীববৈচিত্র্য সেটা বলে দিতে হয়না।

হেক্টর যেতে আসতে আমাদের শ্লথ দেখিয়েছে দুইটা, কিছু শকুন আর প্যারট টাইপের পাখির ঝাঁক আর বাসাও দেখিয়েছে। ফেরার পথে আমার ঘোড়াটা মাঝেমাঝেই থেমে যাচ্ছিল। সবাই মজা করছিল, একথা বলে, টিনা নাকি থেমে থেমে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। তাই হেক্টর সাহেবকে প্রায়ই নেমে আসতে হচ্ছিলো একটু শাসন করতে। এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আর একরাশ স্মৃতি নিয়ে শেষ হল আমাদের অশ্বযাত্রা। একথা বলবো না আমি, যে একদমই ভয় পাইনি। প্রথম দিকে বেশ ভয় পেয়েছি। তবে ধীরে ধীরে সে ভয় কেটে গিয়েছে। তখন বরং বেশ উপভোগই করেছি। আজকেও কিছুক্ষণ হট স্প্রিং পুলে দাপাদাপি করলাম। এরপর স্নান ও লাঞ্চ সেরে ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে চললাম।

আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেটা একটা প্রাইভেট রেইন ফরেস্ট রিজার্ভ। মিস্টিকো এরিনাল হ্যাঙ্গিং ব্রিজ পার্ক। বেশ কয়েকটা ঝুলন্ত ব্রিজ আছে এখানে। কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী আরো আছে প্রায় ৭০০ প্রজাতির প্রাণী, ৩০০ প্রজাতির পাখি ও ৭০০ প্রজাতির উদ্ভিদ। রেইন ফরেস্ট আর ক্লাউড ফরেস্ট এই অঞ্চলের আরেক বৈচিত্র্য। পুরো দেশটাই হোম টু ফরেস্ট। ক্লাউড ফরেস্ট আমি যা বুঝেছি অনেকটা রেইন ফরেস্টের মতোই। কিন্তু এটা অধিক উচ্চতায়, সাধরণত পাহাড়ের গায়ে বা উপরে অবস্থিত। নামেই বোঝা যাচ্ছে, ওখানে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় সবসময়ই মেঘ থাকে। বনের মাথায় সারাবছর সবসময়ই মেঘ। তাই রেইন ফরেস্টের চেয়েও বেশি অন্ধকার এই বন।

আর রেইন ফরেস্ট মানেই বিশাল লম্বা লম্বা গাছ আর প্রচুর বৃষ্টিপাত। কমপক্ষে ১০০-১৫০ ফুট উঁচু উঁচু সব গাছ। কিছু কিছু গাছের উচ্চতা এর চেয়েও বেশি (সর্বোচ্চ ২০০ ফুট)। সারাবছরই আবহাওয়া এখানে কমবেশি একই রকম। প্রতিদিনই বৃষ্টি নামে ঝুপ করে। আবার দেখতে দেখতে শেষও হয়ে যায়। দিনে ১০-১৫ বার বৃষ্টি খুব স্বাভাবিক ঘটনা এখানে। আগেই বলেছি, রেইন ফরেস্টের আসল সৌন্দর্য এর উপরে। গাছগুলোর উঁচু ডালপালা আর পাতা, ছাতা বা শামিয়ানার মতো গাঢ় ছায়া দিয়ে রাখে বনের ভূমিকে। এই শামিয়ানা বা ক্যানোপিই হল রেইন ফরেস্টের আসল সৌন্দর্য যেটা দেখতে হবে একটু উপর থেকে। যারা প্রাণবৈচিত্র্য ভালোবাসেন তাদের জন্য বনের ভিতরটা অবশ্যই আদর্শ জায়গা। কিন্তু যারা আমার মত, তারা রেইন ফরেস্টকে দেখতে হবে উপর থেকে। ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে এই ক্যানোপিই দেখতে এসেছি আমরা।

আমরা যখন এই পার্কে পৌঁছাই, তখন প্রচন্ড বাতাস বইছে। হিমশীতল দমকা বাতাসে দূর পাহাড় থেকে মেঘ ভেসে ভেসে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ এসে চারপাশ ঘিরে ফেলল। অতঃপর নামলো ঝুম বৃষ্টি। এখানে আসার পর থেকে প্রতিদিনই বৃষ্টি দেখছি। ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি আসে দিনে ৫-৬ বার। কিন্তু ১ মিনিটের বেশি দীর্ঘ হয়না। কিন্তু আজকের বৃষ্টিটা অন্যরকম। মেঘটাও ছিল নিকষ কালো। আজকে এমনিতেই বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। আমাদের একটা ছাতা আছে বটে। কিন্তু এই বৃষ্টি তাতে মানবেনা। অগত্যা পার্কের প্রবেশমুখে রেস্টুরেন্টে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। তাতে লস হয়নি একটুও। রেস্টুরেন্টের খোলা জানালা দিয়ে পাহাড়ি বৃষ্টির অদ্ভুত সৌন্দর্য আবিষ্কার করলাম। বৃষ্টি কিছুটা ধরে এলে পার্কের ম্যাপ নিয়ে ঢুকে পড়লাম। ৩.২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটা ট্রেইল চলে গেছে রেইনফরেস্টের মধ্য দিয়ে। এই ট্রেইল ধরে এগুলেই পড়বে বেশ কয়েকটা ঝুলন্ত সেতু। সবচেয়ে লম্বা ব্রিজটি প্রায় ৩০০ ফুট দীর্ঘ। প্রথম যে ঝুলন্ত ব্রিজে উঠলাম সেটা এরিনাল ভলকানো ভিউ ব্রিজ। ব্রিজের মাঝামাঝি যখন গেলাম, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমরা আশেপাশের অধিকাংশ গাছের চেয়ে উপরে আছি। নিচে তাকালে প্রায় ১৫০-২০০ ফুট নিচে দেখা যাচ্ছে বনের ভূমি! কি রোমাঞ্চকর সেই অনুভূতি! সেই সাথে বৃষ্টিস্নাত বাতাস। আকাশে মেঘের গুড়গুড় ডাক। যখন তখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ার হুমকি। এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেলো শরীরে। প্রাণভরে রেইনফরেস্ট তথা এর ক্যানোপির সৌন্দর্য দেখে নিলাম।

পরের একটা ব্রিজে উঠে দেখি, প্রায় ১৫০ ফুট নিচে কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি খরস্রোতা এক নদী। ঝর্ণাটাও দেখতে পেলাম ব্রিজে উঠার আগে এক ঝলক। আমরা যখন মুগ্ধ হয়ে আশপাশ দেখছি, আমাদের দেখতে হাজির হল আরো কিছু অতি উৎসাহী অতিথি। তিন চারটা বানর। কিছুক্ষণ তাদের খেলাধূলা দেখে বেশ মজা পেলাম। আর পাখির কিঁচিরমিঁচির তো আছেই। এখানে নাকি জাগুয়ারও দেখা যায়। কিন্তু তারা সন্ধ্যার পরে বের হয়। এক্সপার্ট গাইডসহ আসলে অনেক বেশি ওয়াইল্ড লাইফ দেখা যায়। আমরা সেটা করিনি। ইনফ্যাক্ট আমরা যখন পার্কে প্রবেশ করি, তখন আমরাই একমাত্র দর্শনার্থী ছিলাম। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো করে জায়গাটা আবিষ্কার করেছি। যতক্ষণ খুশি ঝুলন্ত ব্রিজে দাঁড়িয়ে থেকে ক্যানোপি দেখেছি। আর আমাজন রেইন ফরেস্ট কবে দেখতে পাবো সে চিন্তা করেছি।

এরপর আবার ফিরে এলাম লা ফরচুনায়। ডিনারের জন্য গেলাম আরেকটা নতুন সোদায়। আমরা স্প্যানিশ বুঝতে পারছিনা দেখে ইংরেজি জানে এমন একজন নিজেই এগিয়ে এল। ওর নাম ছিল ন্যান্সি। আমরা সবজি খাই, মাংস খাইনা, তার মানে নিরামিশাষী, এটা সে বুঝতে পারছে। কিন্তু আবার মাছ খাই, এটা কোন বিচিত্র খাদ্যাভাস সে খুব আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল। পরে তাকে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। আমাদের দেশের কথা জানতে পেরে ন্যান্সি খুব খুশি হয়ে গেল। তখন সে জানালো, তার হাসবেন্ড ভারতীয়। ব্যাঙ্গালোরে বাড়ি। সে ভারতে বেশ কয়েকমাস ছিল। ওখানে অনেক নিরামিশাষী দেখেছে সে। বাংলাদেশের নামও তখনই শুনেছে। ভারতীয় মসলাদার খাবারের পাড় ভক্ত সে এখন। কিছুদিনের মধ্যে এখানে ভারতীয় খাবারের দোকান শুরু করার পরিকল্পনার কথাও জানালো।

ডিনার শেষে ফিরে এলাম আমাদের কটেজে। আজকে লা ফরচুনায় আমাদের শেষ রাত। আগামীকাল সকালে আমরা রওনা হবো আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। কোস্টারিকার প্রশান্ত উপকূল গুয়ানাকাস্তে প্রদেশ।

চলবে...

Dr. Kamrun Nahar Safia Nishi
আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
পেশায় একজন মা, গৃহিণী ও পার্ট টাইম শিক্ষার্থী।

চেনা সুর, অচেনা বাদক

বেশ ছিমছাম উচ্চতার সে ছোট্ট বাসায় আমি থাকি, তার ঠিক মাথার উপর বেশ অচেনা একটা পরিচিত পরিবার থাকে। পরিচিত বলছি একারনে যে দিন বা রাতে প্রায়শই তাদের অস্তিত্ব জানান দেয় টুকটাক শব্দ ঝংকারে। লিখতে বসেছি সে নিয়ে নয়। কারন এই উপর তলা নীচ তলা বিবাদ বেশ জনপ্রিয় এবং পরিচিত। সেই বাসায় কেউ একজন পিয়ানো শিখে, ছুটির দিনে যখন তখন আর এই কর্ম দিবস গুলোতে সূর্য যখন মধ্য আকাশে গনগনে তাপ ঢেলে ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমে ঢলে গৃহিনীদের মত ভাতঘুমের আয়োজনে। ঠিক তখন শুরু করে তার নিয়মিত অনুশীলন টুংটাং ডো-রে-মি-ফা-সে-লো-টি-ডু থেকে শুরু। এরপর তার পছন্দ মত সুর সে বেছে নেয়। কবে থেকে ঠিক মনে নেই আমার পরন্ত বিকেলগুলো'র মতই ক্লান্তহীন সে লক্ষের দিকে এগিয়ে চলে।

বছর দুয়েক হয় প্রথম দিকে ছিল সেই একঘেয়ে সা-রে-গা-মা-পা আর মাঝে মাঝে কর্কশ বেজে উঠা শব্দ কেবল। আজকাল বেশ মালা ছেড়া মুক্তার মত আয়েশে গড়ায় সুর, আহলাদি চাঁদের জোছনার মত ঢলে ঢলে পড়ে কানে। বেশির ভাগ গানই আমার অপরিচিত আমি অত ইংরেজী গানে অভস্ত্য নেই বলে অথবা সে কোন আরবী গানের গুণগুণ কি না তাও জানিনে। সাউন্ড অফ মিউজিকের সুরগুলো অথবা টপচার্টের ইংলিশ, আমার ছেলে তখন সেই সুরের সাথে গলা মেলায়,মাঝে মাঝে দেখি এদেশের জাতীয় সংগীত এর অনুশীলন করছে।

বাচ্চারা স্কুল থেকে ফেরার পরের এই সময়টা আমার ব্যালকনিতে কিছু সবুজ আর খুনসুটি করা জোড়া ঘুঘুর সাথে কাটে, কখনো সাথে চাবই অথবা মোবাইলে ফেসবুক আর ব্যাকগ্রাউন্ড

মিউজিকের মত বেজে চলা পিয়ানো সুর। অবসরের এই মুহূর্তটুকু শ্রাবনের বৃষ্টির মত অযাচিত ভালো লাগায় ঋদ্ধ করে।

আজকাল অধ্যাবসায়ী সেই পিয়ানো বাদককে দেখতে ইচ্ছে জাগে; কোন জাতীর সে! আরবদেশীয়! ইউরোপ থেকে আসা কেউ অথবা এশিয়, ভারতীয়, পাকিস্থানী, ফিলিপিনো নাকি আফ্রিকা মহাদেশের কেউ। হয়ত লিফটে উঠা নামায় দেখেছি অথবা সন্ধ্যায় সবুজ চত্তরে। খুব সহজ জেনে নেয়া আমার একলা ঘুঘুর সাথের বিকেলেগুলোতে আনন্দ বেদনার সুরে ভেজানো বাদককে।

পরক্ষনেই ভাবি থাকনা কিছু দৃষ্টির অগোচরে নাই বা জানলাম।কেবল সুর ধারার সে অনুজ শিক্ষার্থীর জন্য শুধু অন্তর থেকে শুভ কামনা আর আশীর্বাদ একদিন তার অধ্যাবসায় তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য পাক। সব কিছু জেনে ফেলা আমার ভালো লাগে না কেনো যেন!!

আজকালের সব রহস্যভেদ করা আর সব জেনে ফেলা প্রজন্মের চেয়ে আমি যে আমার আধো রহস্যময়, স্বপ্ন আঁকা সময়কে বেশী ভালোবাসি।

মনিরা সুলতানা
গৃহবধূ, দুবাই
sultana.manira@gmail.com

সৈনিকের দুঃস্বপ্ন

গ্রেনেডশূন্য হাতটা কাঁপছে
দূরের মানুষগুলোর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী
মুহূর্ত আগের উন্মত্ততা ভুলে স্নায়ু অবশ হয়ে আসে আমার
আজকে রাতে এই মানুষেরা সার বেঁধে আসবে দুঃস্বপ্নের ঘোরে
কারো পা উড়ে গেছে, কারো বুক এফোঁড় ওফোঁড়
কারো বা খুলির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসবে গলিত মগজ
সবাই মিলে নেড়ে চেড়ে দেখবে
আমার মাথার কাছের রকেট লঞ্চার
কিংবা ঘুমন্ত হাতের সজাগ স্পর্শে রাখা এ.কে.ফর্টি সেভেনটাকে
চোখহীন কোটর থেকে চুঁইয়ে রক্ত বের হওয়া শিশুটা
সে আমাকে ঠেলে ওঠাবে ঘুম থেকে
জানতে চাইবে তার বাম চোখ কোথাও দেখেছি কিনা
প্রতিদিন বেয়োনেটে খুঁচিয়ে মারি ওদের
মর্টারের নির্মম আঘাতে থামিয়ে দেই হৃতকম্প
যেমনটা আমাকে বলে দেয়া আছে
তবুও দিনের আলো মরে গেলে
মরাগুলো ঠিকই উঠে আসবে মৃত্যুপুরী থেকে
সৈনিকের দুঃস্বপ্নের ঘোরে
হিসেব নিয়ে যাবে খোয়া যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের।।

-ড. রিম সাবরিনা জাহান সরকার:
মিউনিখ, জার্মানি।

অক্টোবর ফেস্ট

বাংলা প্রবাদে আছে মেয়ে, মদ আর তাস, এ তিনে হয় সর্বনাশ। অক্টোবর ফেস্ট হল এই তিন প্রসরার এক আয়োজন। এখানে শুরার সুরে উদ্বেলিত হতে পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে সমাবেত হয় প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ। বেহুঁশ হয়ে আদি উন্মাদনা আর সঙ্গী অন্বেষণের এক মহাসমাবেশ।

অক্টোবর ফেস্ট আসলে কি:

জার্মানে কথাটা হলো 'অক্টোবর ফেস্ট', অর্থাৎ অক্টোবর মাসের উৎসব। যার প্রধান পানীয় হলো বিয়ার।
মল্ট এবং হপ্স থেকে যে হাল্কা শুরাজাতীয় তেতো স্বাদের পানীয়টিকে জার্মানরা শুরা না বলে 'খাদ্যদ্রব্য' বলেন, যে পানীয়টিকে বাদ দিয়ে অক্টোবার ফেস্ট কেন, জার্মানির কথাই কল্পনা করা যায় না।

চটুল সংগীত আর বিয়ার সহযোগে বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে আমোদ করাটাই অক্টোবার ফেস্টের যথার্থ সংজ্ঞা।

সময়কাল:

অক্টোবর ফেস্ট হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় মজার মেলা যা প্রতিবছর নিময় করে পালিত হয় জার্মানির মিউনিখ শহরে। এটি মূলত ১৬ দিনের একটি উৎসব যা প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে শুরু হয়ে অক্টোবরের প্রথম রবিবার পর্যন্ত চলে। এই ফেস্টের মূল আকর্ষণ হল পানীয়। মিউনিখ শহরের নগরপিতা শনিবার ঠিক রাত বারোটায় বিয়ারের ব্যারেল খুলে উদ্বোধন করেন এই ফেস্টা।

জার্মানিতে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ পানীয়ের মধ্যে একটি হল বিয়ার আর এই উৎসব চলাকালীন বিয়ারের বন্যা বয়ে চলে। আগামী বছর মেলার সময়সূচী-
https://www.oktoberfest.de/de/article/Termine/Termine/Oktoberfest+2019+-+Kalender/4927/

বিবিধ:

১। প্রতিদিন ১০০০ টন আবর্জনা সংগৃহীত হয় এ মেলাতে
২। লোক সমাগম হয় ৬.০-৭.০ মিলিয়ন, ২০১৮ তে ৬.৩ মিলিয়ন লোকের সমাগম হয়।
৩। পানীয় পান করা হয় ৭.৫ মিলিয়ন লিটার (সূত্র: বিবিসি ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮)

কিভাবে শুরুর হল:

১৮১০ সালের ১৭ অক্টোবর তৎকালীন বাভারিয়া রাজ্যের ক্রাউন প্রিন্স লুডভিশের বিয়ে উপলক্ষে এক ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল মিউনিখ শহরে, যা রীতিমত এক উৎসবে পরিণত হয়েছিল সে সময়। তার রেশ ধরে পরের বছরও আয়োজন করা হয় এই উৎসবের। আশেপাশের গ্রামের কৃষিজীবীরা তাঁদের পণ্য উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে যান সেখানে।
১৮১৯ সাল থেকে বিয়ার, ওয়াইন এবং মুখরোচক রুটি-বিস্কুটের স্ট্যান্ড আকৃষ্ট করতে থাকে দর্শকদের। সেই সাথে যোগ হয় নাগরদোলা, চরকিতে চড়ার আনন্দ। তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে বিয়ারের তৃষ্ণাটাই প্রাধান্য পেতে থাকে এখানে। অক্টোবর উৎসবের শুরুটা এভাবেই। ও হ্যাঁ, নামটা অক্টোবর ফেস্ট হলেও নিছক ব্যবসার দিকটাই মাথায় রেখেই সেপ্টেম্বরে শুরু করা হয় উৎসব। এই সময়টাতে আবহাওয়া কিছুটা হলেও সদয় থাকবে, দর্শকদের উপস্থিতি বাড়বে, বেঁচাকেনা ভাল চলবে, এই আশা থেকেই উৎসবকে কটা দিন এগিয়ে আনা হয়।

অক্টোবর ফেস্ট স্থান:

স্থানটির নাম ক্রাউন প্রিন্স লুডভিগ-১ এর স্ত্রী, স্যাক্স-হিলবার্গেজেনের রাজকুমারী Therese (Princess Therese of Saxe-Hildburghausen) থেরেসের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। এইখানে যে আরবান স্টেশন তার নাম ও টেরেসেনভিসে (U-Bahn: Theresienwiese) । তাদের বিবাহ ১৮১০ সালে থেরেসিয়েনসিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপরে, প্রতি বছরই **অক্টোবর**ফেস্টটি উদযাপনের জন্য প্রতি বছর সমবেত হয় বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসা সুরাপ্রেমী নানা বর্ণের মানুষজন।

পোশাকের বিশেষত্ব:

পুরুষ শাষিত সমাজ, বৈষম্য যার নিয়ামক, সাম্য সেখানে বিলীন। সে হোক প্রশ্চাদপদ সমাজ কিংবা অধুনা ইউরোপ।

ছেলেঃ Lederhosen একটি ঐতিহ্যগত পরিচ্ছদ হতে উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং, তারা কৃষকদের জন্য কাজের পরিধান হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে জার্মানরা ইতিমধ্যে বুট হিসাবে পোশাকের নিবন্ধ তৈরির জন্য চামড়া ব্যবহার করে আসছে। চামড়া শ্রমিক ও চাষীদের কাজের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিধান করা ভাল উচ্চ মানের উপাদান ছিল। ষোল শতাব্দীতে, ফরাসি culottes (বা হাঁটু breeches) ইউরোপ জুড়ে জনপ্রিয়তা পায়। ফরাসিরা তাদের কাপড় নরম কাপড় থেকে তৈরি করেছিল, কারণ কুলোটগুলি অবসর এবং আরামদায়ক পোশাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮ শতকের মধ্যে, আল্পসের জার্মান ও অস্ট্রিয়ান কর্মীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য culottes শৈলী গ্রহণ করেন।

উচ্চ-শ্রেণীর জার্মানরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া এবং শিকারের মতো বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের জন্য লিডারহসেনকে বুদ্ধিমান পোষাক হিসাবে খুঁজে পেয়েছিল। উপরন্তু, ১৮ শতকের মধ্যে কৃষক শৈলী অনুকরণ করার জন্য উন্নত সমাজের জন্য এটি ফ্যাশনেবল হয়ে উঠেছিল। লেডারহসেন এখনও কৃষক সমাজের পথে তাদের পথ অবলম্বন করেছেন, যদিও কৃষকদের দ্বারা এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী জার্মান পোষাক হিসেবে লিডারহোসেনটি আবির্ভূত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে, প্যান্টালুন এবং ট্রাউজারগুলি ইউরোপীয় ফ্যাশনগুলিতে কুলোটের স্থান গ্রহণ করতে শুরু করে। যেহেতু সভ্যতা এখন অনুসরণ করার জন্য নতুন প্রবণতা খুঁজে পেয়েছিল, তাই লিডারহসনে তাদের আগ্রহ তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এরপর লেডারহসেনকে আবারও কৃষক পোশাক হিসেবে দেখানো হয়েছিল যা শহরের অধিবাসীদের জন্য অনুপযুক্ত ছিল (ইউরোপীয়রা সবসময় তাদের মধ্যে সামান্য হিপস্টার ছিল বলে মনে করে)। দেশের শ্রমিকদের জন্য, লেদারহসেনকে অবশেষে একটি ভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে আউটসোর্স করা হয়েছিল যার নাম জিন্স (যা সাংগঠনিকভাবে লিভি স্ট্রস, জার্মানি থেকে বিদেশী হিসাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল)। জিন্সকে শুধুমাত্র কাজের উদ্দেশ্যে হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, অল্প বয়সী প্রজন্ম তাকে একটি জনপ্রিয় আমেরিকান ফ্যাশন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। মাঝে কিছুকাল লেডারহোসেন অপ্রাসঙ্গিক থেকে আবার এর পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। ১৮৮০'র দশকে মিউনিখের প্রতিষ্ঠিত ক্লাবগুলি ব্যাভারিয়ান সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা শুরু করে। ১৮৮৭ সালে অক্টোবরফেস্ট সবচেয়ে বড় আকারে অনুষ্ঠিত হয়ছিল, তখনই অংশগ্রহণকারীদের জন্য লিডারহোসেন এবং ডারন্ডলগুলি আনুষ্ঠানিক পোশাক হিসেবে গৃহীত হয় এবং আজও সে নিয়মেই চলছে।

ছেলেদের পোশাকের জার্মান নাম

- Trachtenschuhe - Haferlschuhe/Haferl shoes
- Trachtenlederhose:
- Trachtenhemden:
- Lodejacken & Westen:
- Trachtenjacke:
- Besonders edel.
- Loferl & Socken

Source: https://www.tchibo.de/oktoberfest-wiesn-ratgeber-c400071525.html
https://tetyamotya.ru/bn/womens-fashion/what-clothes-were-worn-by-russian-women-russian-folk-clothes-with-patterns.html

অক্টোবর ফেস্টের ছেলেরদের পোশাক

ছেলেদের জন্য লেদার পেন্ট আর বায়ার্ন সাদা বা লাল চেকের শার্ট। শার্টের উপরে সাধারণত লেদার ব্রেসেস পরে থাকে এবং সেই ব্রেসেস পেন্টের সাথে যুক্ত থাকে বা খোলা থাকে।

ব্রেসেস এর মদ্ধেও একটি মজার বিষয় লুকিয়ে আছে, যেমন যদি কোন ছেলের ব্রেসেসে পিছনে ক্রস থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে সে মেয়ে সঙ্গিনী খুঁজছে না, অর্থ্যাৎ তার সঙ্গিনী আছে।

এছাড়া জুতার ব্যাপারে যদি বলতে হয়, তাহলে তাদের পছন্দের তালিকায় লেদারের জুতাই থাকে আর সাথে থাকে রঙ-বেরঙের মোজা। কেউ লাল কেউবা নীল অথবা সাদা । স্বভাবতই জামা জুতার সাথে মিল রেখে মোজা, ক্যাপ পরিধান করে থাকে।

২। **অক্টোবর ফেস্টের মেয়েদের পোশাক:** ডিন্ডল এর ইতিহাস নেতৃত্বের সাথে সমান্তরাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মানিতে ডার্ডন্ড আবির্ভূত হয়েছিল যাতে কৃষকদের কাজের সময় কাজে আসে। এই মহিলা ট্র্যাচটি ঘরের ও খামার শ্রমিকদের দাসী পোশাকের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

১৮ শতাব্দীতে উচ্চতর শ্রেণির নেতৃত্বে লেদারহোসেনের মতোই ডারেন্ডল সমাজের উঁচু সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। কৃষকরা সাশ্রয়ী মূল্যের উলের ব্যবহার করার পরিবর্তে, সমৃদ্ধ ডারন্ডলগুলি সিল্ক, সাটিন এবং ব্যয়বহুল কাপড় দিয়ে তৈরি করে।

নাম তার ড্রিন্ডেল, আর এই পোশাকের মাঝখানে কোমরে ঝুলে থাকা রিবনের দেখে বুঝে নিতে হবে ঐ মেয়ের নারীর সম্পর্কের স্ট্যাটাস। নীচের ছবিতে

Verheiratet: I dad scho meng, aber i derf nerd.

Unentscheiden: Schau ma moi, dann seng ma scho

Singel: A bissal was geht oiwa

Photo Source:

https://www.adlermode.com/magazin/anleitung_dirndl-schleife-richtig-binden/

Info : https://www.dw.com/bn/চলছে-বিশ্বের-সবচেয়ে-বড়-বিয়ার-উৎসব-অক্টোবর-ফেস্ট/a-6056076

https://www.br.de/nachrichten/bayern/6-3-millionen-besucher-auf-dem-oktoberfest,R5mhhBn

--হোসাইন মোহাম্মদ তালিবুল ইসলাম: মিউনিখ, জার্মানি।

নোটিশ

"ছবি মেলা"

সৃষ্টির আনন্দে তৃপ্তি আসেনি, এমন কখনো কারো ক্ষেত্রে হয়েছে কিনা বলা কঠিন। আরো বেশি কঠিন, সেই আনন্দ কাছের বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে স্বস্তি আর সার্থকতা পায়নি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া। "ছবি তোলা" এই সৃষ্টিশীল প্রতিভার একটা বড় স্বাক্ষর খোদাই করে।

হতে পারে শীতের ভোরে ঘুম থেকে উঠে জানালার ধার ঘেসে কুয়াশাসিক্ত নুইয়ে থাকা শিশির ভেজা পাতাগুলোর আর্দ্র সৌন্দর্য হতে পারে আপনার সৃষ্টি, হতে পারে গ্রীষ্মের দাহ্য গরমে বিস্তৃত নদীতে দূর দিগন্তের খোলা আকাশের ডুব দেয়ার মুহূর্ত হতে পারে আপনার সৃষ্টি, হতে পারে শেষ বিকেলে ব্যস্ত পৃথিবীর ঘরে ফেরার তৃপ্তি আপনার সৃষ্টি, হতে পারে একটা পটভূমিতে ল্যাম্প-পোষ্ট কে কোণায় বন্দি করে বাকি পৃথিবীর অন্ধকারকে নতুন করে সৃষ্টি, হতে পারে আমার স্মরণীয় মুহূর্তের সেই ছবি যেটা কে প্রতি বার নতুন করে আপনারই সৃষ্টি। এরকম আরো অনেক রকম সৃষ্টিশীল বিষয় নিয়েই জার্মান প্রবাসে শুরু করতে যাচ্ছে "ছবি মেলা"। আর, ছবিগুলো হবে আপনাদেরই।

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা বা তোলা হয়ত স্মার্ট ফোনে, আজই শেয়ার করুন আমাদের সাথে। ছবি জমা দিতে শুধুমাত্র আমাদের ফেইসবুক পেইজে পোষ্ট করলেই হবে। এখান থেকে নির্বাচিত ছবি গুলো যাবে পরের সংখ্যার ম্যাগাজিনে। আপনাদের সুবিধার্থে ছবি জমা দেয়ার কিছু নিয়মাবলী দেয়া হল। চোখ বুলাতে ভুলবেন না।

১) ছবির রেজুলেশন নুন্যতম ২ মেগাপিক্সেল হতে হবে
২) ছবির সাথে অবশ্যই ছবির প্রেক্ষাপট বা বর্ণনা (যেটা ফটোগ্রাফারের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ) থাকতে হবে। (বাংলা বা ইংরেজিতে)
৩) ছবি তোলার জায়গা এবং তারিখ
৪) ফটোগ্রাফার-এর নাম এবং ঠিকানা

ছবির পাঠানোর জন্য বিস্তারিতঃ http://goo.gl/90IVlk

চোখ রাখুন পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেইজ " জার্মান প্রবাসে"

আর যেকোনো কিছু জানতে german.probashe@gmail.com -এ ইমেইল করতে পারেন।

নোটিশ

পরবর্তী সংখ্যার ম্যাগাজিনের থিম: "পাঠশালা"

জীবনের বহু কিছু সময়ের ফেরে মহাকালের অতলে হারিয়ে গেলেও কিছু কিছু ব্যাপার চিরকালের জন্যে হৃদয়ে গেঁথে রয়। শৈশব কৈশরের পাঠশালার গল্পগুলো তেমন, কখনোই মন থেকে মুছে যায় না। সকালে উঠে চটপট রেডি হওয়া, মাথায় চপচপ তেল মেখে বাবু সেজে বন্ধুদের সাথে হেঁটে বা কখনো খাল বিল নদী পার হয়ে স্কুলে যাওয়া, ক্লাশে বসে দুষ্টামি, হাইস্কুলে উঠে প্রেমে পড়া, স্যারের হাতে বেতের বারি সেকালে যন্ত্রণার হলেও আজ নিশ্চয়ই মনে হলে হাসি পায়।
প্রাইমারীর পর হাইস্কুল, এরপর কলেজ আর তারপর বিশ্ববিদ্যালয়। সবখানেই আমাদের মধুর সব স্মৃতি। সেই স্মৃতি রোমন্থন করেই যেন আমরা বাঁচি।

মনের গভীরে সযত্নে লুকিয়ে রাখা সুখ দুঃখ আর মধুর গল্পগুলো লিখে পাঠান জার্মান প্রবাসের কাছে। আমরা ম্যাগাজিন আকারে আপনার লেখা প্রকাশ করে সবার সাথে সেই স্মৃতি ভাগাভাগি করে নিব।

ডেডলাইনঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮

লেখা পাঠানঃ German.Probashe@gmail.com
অথবা পেজের ইনবক্সে পাঠানঃ www.facebook.com/pages/জার্মান-প্রবাসে/212610425614429
ছবির পাঠানোর জন্য বিস্তারিতঃ http://goo.gl/90IVlk

লেখার সাথে নাম ঠিকানা পেশা আর একটি ছবি অবশ্যই পাঠাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শুধু জার্মানি বা বাংলাদেশ থেকেই নয়, যেকোন দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাদর আমন্ত্রণ আমাদের ম্যাগাজিনে! তাই আমাদের ম্যাগাজিনে লিখতে হলে আপনাকে বাংলাদেশ বা জার্মানিতেই থাকতে হবে অথবা আমাদের ধরিয়ে দেওয়া টপিকেই লিখবে হবে এমন কোন কথা নেই! যে কেউ যেকোন দেশ থেকে যেকোন টপিকে লেখা পাঠাতে পারেন।

[redacted]

টিম জার্মান প্রবাসে

চিফ এডিটরঃ দেবযানী ঘোষ, উলম

এডিটরঃ জাহিদ কবীর হিমন, আখেন

কো-এডিটরঃ ড. রিম সাবরিনা জাহান সরকার, মিউনিখ

চিফ মার্কেটিং অফিসারঃ আনিসুল হক খান, মিউনিখ

চিফ অর্গানাইজিং অফিসারঃ হোসাইন মোহাম্মাদ তালিবুল ইসলাম , মিউনিখ

গ্রাফিক ডিজাইনারঃ নাজিহা মোহাম্মদ, সিডনী

কোওর্ডিনেটরঃ রশিদুল হাসান, উলম

কোওর্ডিনেটরঃ শরিফুল ইসলাম,মাগদেবুর্গ